দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য : মানস গঠনের প্রেক্ষিতে

কাজী নজরুল ইসলামের বয়স যখন ছয় বছর সেই সময় ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত শুরু করেন। চুরুলিয়া গ্রামের ছোট্ট নজরুল জীবিকার তাগিদে হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো স্কুলে যেতেন, কখনো লেটোদলের সঙ্গে বেড়াতেন, আবার দোকানে রুটি বানানোর কাজে লাগতেন, আবার কখনো কখনো রেলের গার্ডসাহেবের বাবুর্চির চাকরি নিতেন। এইভাবে নজরুল পেটের তাগিদে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতেন। এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে নজরুলের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের বুকেও চলছে অত্যাচার। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবাসীর উপর চালাচ্ছে অত্যাচার, শোষণ, শাসন এবং দমন নীতি। এতকাল ভারতবাসী শীতঘুমে দিন অতিবাহিত করতো, দেশের, দশের চিন্তা ভাবনা তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবাসী সম্বিত ফিরে পেলো। শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজদের চালাকি বুঝতে পারলেন। যার ফলে বাঙালীরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করার জন্য আন্দোলনে নেমে পড়লেন। কখনো পথ অবরোধ, কখনো অনশন, ধর্মঘটের মাধ্যমে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা শুরু করলেন।

এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না। তা ধনী - গরীব নির্বিশেষে সাধারণ জনমানসের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। ফলে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের মাত্রা বৃহত্তর হতে থাকলো। এই সময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আরো বেশি বিস্তার লাভ করল। শুধু তাই নয়, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য জনমানস এদিকে তৈরী হয়ে গেল। অত্যাচারি ইংরেজ ভারতীয় আন্দোলনকারীদের উপর প্রতিহিংসা ও দমনপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। যার ফলে অনেকেই জেলে গেল, অনেকেই আবার ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দিল। কেউ আবার ইংরেজদের গুলিতে মারা গেল।

ইংরেজ কর্তৃক অত্যধিক অত্যাচারের পরেও আন্দোলনকারীদের আন্দোলন থেমে যায়নি, বরং আরও বাড়তে থাকে । বাধ্য হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি বঙ্গভঙ্গকে রদ করে দিল। বঙ্গভঙ্গকে রদ করার যন্ত্রণায় ইংরেজরা নির্যাতন ও দমনপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবীদের দুর্বল করার চেষ্টা করল। জাতীয় কংগ্রেসও কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। তারাও যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। এদিকে আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হয়ে গেল। ফলে বিপ্লবীদের আন্দোলনও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ল। জাতীয় কংগ্রেসও ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু এ যুদ্ধে ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না। ইংরেজরা স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েছিল, ভারতবাসীও ভেবেছিল যুদ্ধ মিটে গেলে স্বাধীনতা ফিরে পাবে। পরাধীনতার গ্লানী আর সহ্য করতে হবে না। যুদ্ধ শেষ হলে পরে ভারতবাসীর ঝুলিতে বিশেষ কিছু পড়ল না। বরং যুদ্ধের ফলে দেশের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ল। সারাবিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটল অর্থনৈতিক মন্দা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, নৈরাশ্য এবং বেকার সমস্যা।

এরপর ইংরেজরা ভারতীয় কংগ্রেসকে হাতে রাখার জন্য বা সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু চেমসর্ফোড শাসন সংস্কার আইন' প্রণয়ন করল। কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেস বুঝতে পারলো এ আইন আর কিছু নয়, একটা ভাওতা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসও আন্দোলনের জন্য তৈরী হয়ে গেল।দেশের আনাচে-কানাচে কংগ্রেস কর্তৃক আন্দোলন, প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল। ইংরেজশক্তি কংগ্রেসের অভিমুখ লক্ষ করে 'রাউলাট অ্যাক্টে'র প্রণয়ন করল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই আইনের বলে ইংরেজরা বিনাবিচারে বন্দী,জেলবন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার, সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা, মিটিং মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু করল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে। সেখানে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিরীহ জনগণের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিবর্ষণের ফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এই অত্যাচারের ফলে সাধারণ জনতা প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পারলেও তাদের মনের মধ্যে অত্যাচারের আগুন জ্বলছিল, সবাই যেন সময়ের অপেক্ষায় ছিল। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ প্রদত্ত 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করলেন। এই প্রতিবাদ সারাদেশের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। জনগণও যেন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেলো।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ আমেদাবাদের সূতাকলে শুরু হয় ধর্মঘট। এদিকে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। দিকে দিকে শুরু হয় ছাত্র ধর্মঘট, বয়কট, অনশন। বৃটিশ সরকার তাদের অত্যাচারের মাত্রা আবার বাড়িয়ে দিলেন। ফলে জেলবন্দীদের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে গেল। জেল পুলিশের দ্বারা জেলবন্দীদের উপর শুরু হল অত্যাচার। জেলবন্দীরাও প্রতিবাদে মুখর হয়ে পড়লেন। জেলের ভিতরেই তারা অনশন, আন্দোলন শুরু করে দিলেন। বিপ্লবীরাও তাদের কর্মকান্ড দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলেন। বিপ্লবী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করল। বিপ্লবী বাঘাযতীন লড়াই শুরু করলেন। শুরু হল অনুশীলন সমিতির আন্দোলন, মানিকতলায় বোমার মামলা আরও কত সব আন্দোলন।

তারপর গান্ধীজির আহ্বানে গণবিপ্লবের অভ্যুত্থান হল। গান্ধীজির ডাকে হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে মিলিত হল। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনও যুক্ত হল। শ্রমিক আন্দোলনও তখন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মুখে। যার ফলে তৈরী হল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। কিছু অসৎ বুদ্ধির ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ফাটল শুরু হল। কিছু দিনের মধ্যে সাইমন কমিশন বর্জনের মাধ্যমে আবার হিন্দু- মুসলমানের মিলন দেখা গেল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের স্ব স্ব স্থানে নিজেদের কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন। হসরৎ সোহাণি নামে এক মুসলিম নেতা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যে দাবি জানিয়েছিলেন, সে প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত না হলেও পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সে প্রস্তাব কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত হয়। কলকাতা ও লাহোর অধিবেশনে সে প্রস্তাব

পুনরায় সমর্থন লাভ করে। এরপর ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আইন অমান্য শুরু করলে গান্ধীজি কারারুদ্ধ হন। তারপর আপস- মীমাংসার চেষ্টা চলল। প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করল না, কিন্তু তৃতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করল। ভারত শাসন আইন নিষিদ্ধ হল। কিন্তু কংগ্রেস তা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলো না। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন শুরু করল।

বিদেশী শাসকের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য দিকে দিকে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। জমিদার, প্রজা, কৃষক, শ্রমিক সবাই এই প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছিল। এই মুক্তি সংগ্রামের শরিকরূপে আমরা পেলাম নীল বিদ্রোহীদের। বৃটিশরা কঠোর হাতে দমননীতি চলিয়েও সে বিদ্রোহ বন্ধ করতে পারেনি। এসবের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল। যেমন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, জাপানের অভ্যুদয় আবার তারই কাছে রাশিয়ার পরাজয়, আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাশিয়ার নাইহিলিজম, কামাল পাশার লড়াইয়ে তুরস্কের নবজাগরণ এবং চিনের বক্সার বিদ্রোহ প্রভৃতি সব ঘটনা।

স্বাধীনতার জন্য বিপ্লববাদের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শক্তির জাগরণও নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। বিভিন্ন কল- কারখানায় শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য শ্রমিক সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করল ।এরই সঙ্গে জন্ম নিল কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে।

এইভাবে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস দেখলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

(i) কৃষক-শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষ নিজেদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

(ii) জনসমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া ।

(iii) যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, ধর্মঘট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনগণের বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে।

(iv) পাশ্চাত্য জ্ঞান - বিজ্ঞানের প্রভাবে নৈতিক ও মানসিক জগতেও নানা পরিবর্তন ঘটে।

(v) শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতেও জোয়ার আসতে শুরু করে।

(vi) জীবন সম্পর্কে গভীর অতৃপ্তি ও হতাশার ছায়া দেখা দেয়।

কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তি জীবন গড়ে ওঠে এই সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্মাদনার মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে নজরুল সমালোচক ড. সুশীল কুমার গুপ্ত বলেছেন — " অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়- তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত এই যে পটভূমি — এই পটভূমিতেই নজরুল ইসলামের আবির্ভাব, তিনি লালিত - পালিত হন এরই পরিবেশে এবং তাঁর কবিত্ব শক্তির স্ফূরণ ও বিকাশও এই যুগেই ঘটে। তাই এই যুগের আশা, আকাঙ্খা ও দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনে ও কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য বিচারে যুগমানস তো অনস্বীকার্য মানদন্ড। এই মানদন্ডেই তাঁকে বিচার করতে হবে, খতিয়ে দেখতে হবে তাঁর রচনা।" ১ ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ফলে শহর থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলাও অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় । সেই প্রভাব থেকে নজরুলও রক্ষা পান নি। চুরুলিয়ার মত গ্রামের

ছেলে নজরুলকে তাই 'দুখু মিঞা' বলে ডাকা হয়। নজরুল যখন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়েন সেই সময় জীবিকার তাগিদেই বৃটিশের ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে চাকরী নিয়ে করাচী চলে যান। শুধুমাত্র জীবিকাই নয় যুদ্ধের উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পরবর্তীকালের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া।

এই সময় ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন বিশ্বের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল তেমনি রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলন ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লবও বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছিল। রাশিয়ায় তখন জারের শাসন চলছিল । শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জারের শাসনের অবসান ঘটে, মুক্ত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়। নজরুল যখন করাচীতে ছিলেন সেই সময় রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের খবর রাখতেন। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নজরুল আপ্লুত হয়ে যেতেন। লালফৌজের প্রতি নজরুলের সমর্থন ও ভালবাসা ছিল। সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে তিনি উদ্বেল হয়ে পড়তেন।'ব্যথার দান' গল্পে যুদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক আন্দোলনের কথাও জানতে পারি। এই গল্পে দেখা যায় দারা এবং সয়ফুলমুল্‌ক আফগানিস্তানের এলাকা পার হয়ে ককেসাসে পৌঁছান, সেখানে তারা লালফৌজে যোগদান করেন। নায়ক দারা লালফৌজে যোগদান করে বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। দারা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আসলে নজরুল চরিত্রেরই ছায়া পড়েছে। দারা প্রেমে ব্যর্থ হলেও সেই ব্যর্থ জীবনকে লালফৌজে যোগদানের মধ্য দিয়ে সার্থক করার চেষ্টা করেছেন। দারা বলেছিলেন -"এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ দলে এসেছি।" সয়ফুলমুল্‌কও একই রকমভাবে বলেছিলেন - "ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম।... আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিল যে , কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা- প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি সঙ্ঘের একজন।" গল্পটি যখন ১৯২০ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় আত্মপ্রকাশ করে, তখন মুজফ্‌ফর আহমদ গল্পটি সম্পর্কে বলেন— "ব্যথার দান একটি ভালবাসার গল্প। এই গল্পের ভিতর দিয়েই বৃটিশের একজন ভারতীয় সৈনিক, ছিল বিশ বছরের যুবক নজরুল ইসলাম যে রুশবিপ্লব ও অন্তর্জাতিকতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।"২ এছাড়া 'লালফৌজ' শব্দটি নিয়ে সমস্যা মনে হলে সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদ গল্পটি ছাপতে গিয়ে 'লালফৌজ' কথাটি বাদ দিয়ে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদল' লিখে দেন। নজরুলও পরে তা অনুমোদন করেন। স্বাভাবিক কারণেই মনে হয় রুশবিপ্লবও নজরুলের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল।

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হন। ফলে বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতি ও ব্যক্তি জীবনের প্রস্তুতি — এই দুই বিষয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যের আলোচনা করতে হবে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি নিয়ে বিরাজমান সেই সময় কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্য সাধনায় কলম ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ উচ্চ আকাশে আসীন থাকলেও মাঝে মধ্যে তিনি মাটিতে নেমে আসার চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন ইংরেজ শাসকের অন্যায় অত্যাচার কবিকে বিচলিত করে তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, সেই সঙ্গে হিন্দু- মুসলমানকে ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করার জন্য রাখিও পড়িয়েছিলেন। এছাড়াও পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ জনতার উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদ হিসাবে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যৌবনকে তিনি চিরজীবি আখ্যা দিয়ে তাকে রাজটীকা পড়াতে চেয়েছেন। আবার আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এসব ভাবনা চিন্তায় তাকে সমসাময়িক জনজীবনের সঙ্গে সামিল করায়। 'এবার ফিরাও মোরে' এবং 'ঐকতান' কবিতায় সে ভাবনাই প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ নিজে যা পারছেন না তার জন্য বিচলিত হয়েছেন সেই সঙ্গে নতুন সম্ভাবনাময় কবির প্রত্যাশা করেছেন। যে কবি মাটির কাছাকাছি থেকে সাধারণ মূক মানুষের বেদনা, অত্যাচারের কথা তুলে ধরবেন তার কবিতায় সেই সময়কালের কোনো কবির রচনাতেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, বিশেষ করে উৎপীড়িত জনগণের কথা পাওয়া যাচ্ছিল না। বেশির ভাগ কবিরাই রবীন্দ্র পরিমন্ডলের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিলেন। সারাদেশ ব্যাপী মানুষ যখন অত্যাচারিত হচ্ছিল, বাংলার মানুষ যখন প্রতিশোধের আকাঙ্খায় গুমরে গুমরে উঠছিলেন সেই সময় রবীন্দ্রানুসারী কবিরা সে বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সাম্যের বাণীর সঙ্গে ধনী- নির্ধন, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদহীনতার কথা বলেছেন। আবার কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায় প্রমুখ কবির রবীন্দ্রবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। বিশেষ করে সেই চিরাচরিত প্রথা প্রেম, রোমান্টিকতা আর সৌন্দর্যবোধের মধ্যেই আবদ্ধ। কোথাও কোথাও পল্লী প্রাণতা এবং পল্লীজীবনের ফেলে আসা আনন্দ ও সুখের সন্ধান করেছেন। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কবিতার বিষয় গার্হস্থ্যপ্রীতি ও গৃহগত প্রাণের সুখ ও প্রেম । সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে ছন্দের আভিজাত্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রবৃত্তের মধ্যেই ডুবে গেলেন ।

তবে এই সময়ে মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র জগতের মধ্যেও নতুনত্বের আমদানী করলেন। দুজনেই রবীন্দ্রজগৎ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য আত্মমুক্তি ঘোষণা করলেন। মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের 'আত্মাকে' অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে পঞ্চইন্দ্রিয় অর্থাৎ দেহকেই স্বীকার করলেন। দেহের মান্যতা দেওয়ায় তিনি হয়ে গেলেন দেহাত্মাবাদী কবি। আবার অপরদিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রেম, রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে দুঃখকেই বরণ করে নিল। তাঁর কাছে আনন্দই সব কিছু নয়, দুঃখই তার কাছে বড়। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে তাই বলা হয় দুঃখবাদী কবি। দুজন কবিই রবীন্দ্র প্রভাব থেকে বেড়িয়ে এলেন। মোহিতলাল বিখ্যাত সব কাব্যরচনা করলেন।

যেমন— 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'হেমন্তগোধূলি' ও 'ছন্দচতু র্দশী', প্রভৃতি। দেহাত্মবাদী কবি দেহের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

টিটকারী দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি –
চুমুকে চুমুকে দাও বারবার, পড়ো গো সবাই চুলি।
আমরা ডরিনা মৃত্যুরে কেউ, শব- শিব একাকার !
জীবন সুরায় নিঃশেষ করি দেখি যে 'তলানি'সার !

যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের কাব্যগুলি হল - 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম', 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা' প্রভৃতি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্য প্রকাশের গদ্যধর্মী স্বচ্ছতা নিয়ে ও ভাষার বৈচিত্র্য দিয়ে বাংলা কাব্য— কবিতায় এক নতুন স্বাদ এনে দিলেন। যেমন—

প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারেনা বারোটার বেশি রাতি।

কিংবা

চেরা পুঞ্জীর থেকে/একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে।

প্রভৃতি কবিতার লাইনগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পাঠক চমকে গিয়েছিলেন । কিন্তু এসব দেহাত্মবাদ আর দুঃখবাদ মূলত রবীন্দ্র বিরোধীতার জন্য। কিন্তু দেশের কথা, পরাধীনতার জ্বালা, বিক্ষোভের কথা কারও কাব্য কবিতায় পাওয়া যাচ্ছিল না। মানুষের অভাব- অনটনের কথা তুলে ধরলেও তার মূল কোথায় ? কিংবা বিদেশী শাসকের অত্যাচারের স্বরূপ কোথায় ? কিভাবেই বা তার প্রতিকার বা প্রতিবাদ করা যায় ? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু সারা বাংলার মানুষ সে কথারই উত্তর খুঁজছিলেন। বাংলার মানুষ কারো না কারো কাছ থেকে প্রেরণা, উৎসাহ এবং সাহস পেতে চাইছিলেন। মোহিতলাল জনতার প্রাণকে স্পর্শ করতে পারলেন না। যতীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়লেন। তিনি মরীচিকা মরুশিখার জ্বালা পার হয়ে ত্রিযামা নিশান্তিকায় আনন্দের অনুধ্যানেই শেষপর্যন্ত নিমজ্জিত হলেন।

বাংলা সাহিত্য যখন, কখনো রবীন্দ্রবৃত্ত, কখনো রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে ঘোরাফেরা করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে নজরুলের আবির্ভাব। সৈনিক নজরুল এবার কবি নজরুল হলেন। করাচীতে থাকার সময় কিছু কিছু উপন্যাস,ছোটগল্প ও কবিতা লিখলেও এবার থকেই তিনি যথার্থ সাহিত্য জীবন শুরু করলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও নভেম্বর বিপ্লব দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। করাচীতে থাকাকালীনই কবি নভেম্বর বিপ্লবের খবর রাখতেন গোপনে। বাঙালী পল্টন ভেঙে গেলে নজরুল দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এসে কবি যা প্রত্যক্ষ করলেন, তাতে কবি আহত হলেন। দেশ জুড়ে চলছিল বৃটিশ শক্তির শাসন ও শোষণের নগ্ন চেহারা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুফল ভারতবর্ষের বুকেও তাঁরের

মত বিঁধেছিল। কোথাও অর্থনৈতিক মন্দা, শ্রমজীবি মানুষ ও কৃষককুল অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। এই সমস্ত অভাব-অনটনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুরে চলছে জাতিগত সমস্যা, ধনী-গরীবের ভেদাভেদ, বর্ণ-বৈষম্যের মত মারণরোগ। তার উপর বৃটিশদের তাড়ানোর জন্য চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এসমস্ত দেখে কবি হতবাক্ হয়ে পড়লেন। কবি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু চুরমার করতে চাইছিলেন, শুধু যেন সময়ের অপেক্ষা। নজরুল মনের জ্বালাকে উগরে দিয়েছিলেন তাঁর কাব্য কবিতায়, সেই প্রসঙ্গ গদ্য সাহিত্যেও প্রভাব ফেলেছে।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক ড. সুবোধ কুমার যশ বলেছেন—"বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে নজরুলের আবির্ভাব উল্কার গতি নিয়ে। শুধু উল্কার গতি নিয়ে নয়, তার জ্বলন ও দীপ্তি নিয়েও। বাংলা সাহিত্যে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা- বিপুল উচ্ছাস, প্রচন্ড উল্লাস, দুর্দম গতিবেগ। সর্বস্তরের সামাজিক অনাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। সমানতালে প্রতিবাদ-আন্দোলন- বিদ্রোহ বিদেশী শাসন রাজের বিরুদ্ধে। সমকালও এইসব জ্বালাময়ী রচনা এবং তার রচনাকর্তাকেই চাইছিল।" ৩ নিম্নে সে সব আলোচনা করে স্বতন্ত্র নজরুলের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব :

বাংলা কাব্যসাহিত্য নজরুল ব্যতিক্রমী কবি। তাঁর কাব্যসাহিত্য আলোচনা করলে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) গ্রামবাংলার মাটির কাছাকাছি হয়ে কবির আবির্ভাব।
(২) নিঃস্ব হয়ে বাংলাকাব্যে আগমন, এর পূর্বে এমন সর্বহারা কবি কেউ ছিলেন না।
(৩) জাতিতে মুসলমান কিন্তু মননে ধর্মমুক্ত।
(৪) ভাষা ও প্রকাশে কোনো শিক্ষিত আভিজাত্য হিসাবে নয়।
(৫) অত্যাচারিত দেশবাসী ও সাধরণ জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ।

এইভাবে নজরুল এক ব্যতিক্রমী কবি হয়ে বাংলা সাহিত্যে তথা সমাজে অবতীর্ণ হবার পর সমস্ত বাংলার মানুষ যেন প্রেরণা খুঁজে পেলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নজরুলকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন—

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন ?
অলক্ষের তিলক রেখা রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক্ মেরে আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম ও প্রধানতম পরিচয় তিনি বিদ্রোহী কবি। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নজরুলের কাব্য জীবনের মেনিফেস্টো। এই কবিতার প্রতিটি ছত্র পরাধীন বাংলার যুবসমাজকে উদ্দীপ্ত করে তোলে—

"বলো বীর—
বলো উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমার নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!"

এ ছাড়াও কবি পরবর্তীকালে কয়েকটি বিদ্রোহাত্মক কাব্য রচনা করেন, যে কাব্যগুলি পড়লে বোঝা যায় সেগুলি মূলত বিপ্লব ও বিদ্রোহের আহ্বান, বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশ শুধুমাত্র পরাধীনতার জ্বালা নয়, অনেক দিনের পরাধীনতার অভিশাপে বাংলার সমাজজীবনে যে প্রচন্ড প্রতিবন্ধকতা বেড়ে উঠেছে পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব কিছুকে ভেঙে চুরমার করতে চান। দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজদের অত্যাচার, অত্যাচারিত ভারতবাসীর বেদনা ও বিক্ষোভ, সামাজিক শোষণ ধনী-নিধনের বৈষম্য, হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক লড়াই ও তার অন্ধতা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, অর্তনৈতিক নিষ্পেষণ, নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের মর্মজ্বালা, নারীদের অসম্মান, জোতদার ও জমিদারদের সাধরণ প্রজাদের প্রতি পীড়ন ও শোষণ, রাজনৈতিক খামখেয়ালীপনা, আন্দোলনের নামে লোক দেখানো বৃটিশতোষণ, এই সমস্তই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত পাষাণ ভারকে তিনি ছেঁটে দিতে চান। তাছাড়া কবির শান্তি নেই। সেই কারণে কবি বলেছেন—

'আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে - বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না —

বিদ্রোহী রণ- ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত ! "

'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমি' শব্দটি অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। আমি অর্থাৎ যুবসমাজের প্রতিরূপ, কবি বলতে চেয়েছেন বৃটিশ শাসন-শোষণ, অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। 'আমি' মানে বিচ্ছিন্নভাবে নজরুলের আত্ম-উপলব্ধি নয়। নজরুল কাব্য-কবিতায় বাংলার সাধারণ মানুষের প্রাণের উদ্দীপনাকে প্রত্যক্ষ ও ঋজুভাবে তুলে ধরেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি 'চিরউন্নতশির' বীরকে সম্বোধন করেই তার সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নজরুল বর্তমানের সমস্যার জন্য বর্তমানের কবি হতে চান। ভবিষ্যতের নবী হওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। কবি 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তা স্বীকার করেছেন।

"বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবি।" যারা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়, তাদের জব্দ করতে যে গায়ের জোর দরকার ছিল হয়তো তা তাঁর ছিল না। তাই তিনি কবিতা লিখে তাদের জব্দ করতে চান। তাই কবি বলেছেন—

" প্রার্থনা করো — যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !"

বিদ্রোহী কবি এখন নিজেই শাসক, নিজেই সম্রাট, নিজেই অধীশ্বর, আবার তিনি প্রেমিকও বটে। নজরুল 'ফরিয়াদ' কবিতায় ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাতে চান, আবার পরক্ষণেই জনগণের সভায় হাজির। "চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।" এইভাবে অবনত মানুষের নিপীড়িত জাগরণেই জগতের মুক্তি চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রনা, নিপীড়ণ কবিকে ব্যথিত করে তুলেছে। যার ফলে কবি ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়েছেন। সেই সব জ্বালাকেই কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই কারণে সাধারণ মানুষ অন্য সব দূরে ফেলে নজরুলকে বরণ করে নিয়েছেন সাদরে।

নজরুল অন্যান্য আধুনিক কবিদের মত দুরূহ কবিতা রচনা করেননি । যতটা সম্ভব সরলভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাব্য রচনা করেছেন। জনতার দুঃখকে তিনি জনতার ভাষায়ই প্রকাশ করেছেন। অতিরিক্ত কলা কৌশল দিয়ে তা ঘোলাটে করেননি। তিনি 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় বলেছেন—

"বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি' ।
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবই!
... ...
ভক্তরা বলে, নবযুগ- রবি ! —
যুগের না হই হুজুগের কবি
বটি ত রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর কষে কষি হৃদ-পেশি ।
দু- কানে চশমা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হতেছে নিদ বেশি !
... ...
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসেনাকো মাথায়, বন্ধু, বড়ো দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিয়ো, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!"

এক বৃহত্তর সমাজের প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী তাঁকে সহ্য করতে পারেনি, বিদেশি সরকার তাঁর পিছনে টিকটিকি লাগিয়েছিল। ফলে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে নজরুল বলেছেন—"দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে ।" কবি সব কিছু দেখে শুনে ক্ষেপে গেলেন কেন। এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানতে হবে। ইংরেজ শাসিত

ভারতবর্ষের যে চেহারা তা দেখে কবি ব্যথিত হয়েছেন। সমাজে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, জাতপাতের বৈষম্য, রাজনৈতিক দলাদলি এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীর আচার - আচারণ তাঁকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে । প্রচন্ড ক্ষোভে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন–

"এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি ভেড়া ও ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।"

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়ে নেতাগিরি করে বেড়াচ্ছে। অথচ বৃটিশ সরকারের অত্যাচার কমছে না। তাহলে কিসের স্বরাজ আর কিসের রাজনৈতিক সংগঠন। সব চাইতে দুঃখের বিষয়, একটি বাচ্চা শিশুর কাছে স্বরাজের কোনো অর্থ হয় না। বাচ্চা শিশু কমপক্ষে একটু ভাত আর একটু নুন চায়। তাই কবি নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেছেন–

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।"

বৃটিশের কাছে ছোট-বড় সবাই সমান। তাদের অত্যাচারে বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও রেহাই পায় না। মায়ের বুক থেকে ছেলে কেড়ে খায়।

"মা-র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস !
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ !"

এসব অত্যাচারের প্রতিবাদ করা যাচ্ছে না। খুন করা ছেলের লাশ বাইরে বের করা যাচ্ছে না। কারণ বৃটিশ সরকার দেখে ফেললে আবার অত্যাচার শুরু করবে। ফলে গরীব মায়েরা পেটের দায়ে ছেলের লাশকে ঢেকে রেখেই ভিক্ষায় বেড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজ রূপ বাঘকে বলি বাঘ খাও হে ঘাস। বাঘকে মাংস খেতে না দিয়ে তাকে ঘাস খেতে বলা আর ইংরেজকে অহিংস বলা দুটিরই কোনো মানে নেই। নজরুল চেয়েছেন পরাধীন দেশের শৃঙ্খল মুক্ত করা। ফলে অমরকাব্য লেখা তার উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি চিরকালের বাণীও শোনাতে চান না।

নজরুল দেশের এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে বার বার ক্ষেপে গিয়েছেন। 'সব্যসাচী' কবিতায় তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

"মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি !
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি।"

আবার নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় বলেছেন—

আবার নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় বলেছেন—
''আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল'
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভু-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী।''

তারপর 'ভাঙ্গার গান' কবিতায় কবি দেশাত্মবোধের ও জ্বলন্ত বিদ্বেষের মন্ত্র-বহ্নি জ্বেলেছেন। এখানে সংযত কোনো আলঙ্কারিক আবরণ নেই। একেবারে স্পষ্ট ভাষায় ডাক দিলেন।--

''নাচে ওই কালবোশেখি,
কাটাবি কাল বসে কী ?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার ভাঙরে তালা !
যত সব বন্দিশালায়
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি !''

আবার 'বিষেরবাঁশি' কাব্যগ্রন্থের 'যুগান্তরের গান' কবিতায়ও নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজকে কবি কোনো দিনই সহ্য করতে পারেননি। অসহযোগ আন্দোলনে সারা দেশ যখন অস্থির হয়ে উঠেছে, কবি তখন দেশবাসীকে আহ্বান করে বললেন।—

''মোরা ভাই বাউল চারণ,
মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইকোমোদের ডর রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা - প্রাণ উটকে দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।''

সমাজের মূল কোথায় নজরুল তা ধরতে পেরেছিলেন। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বাঙালী জীবনে যে অভিসম্পাত গড়ে উঠেছে, কবি তা ধরতে পেরেছিলেন। আগে বলেছি নজরুল রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এছাড়া বাংলার শ্রমিক আন্দোলন, সর্বোপরি মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। অর্থাৎ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সংস্পর্শ তাঁকে শ্রমিক-কৃষক, কুলি-মজুরদের বঞ্চনার অংশভাগী হতে শিখিয়েছে। এ কথাগুলি মনে রাখলে বলা যায়, সমালোচকরা যাঁরা বলেছিলেন নজরুল ধর্মীয় কিংবা লীলাবাদী প্রেমের কবি, তাদের মুখোশ খসে পড়তে বাধ্য। 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি বলেছেন—

"রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এ-সব কাহাদের দান ! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ? — ঠুলি খুলে দেখো, প্রতি ইঁটে আছে লিখা।
তুমি জান নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ওই পথ, ওই জাহাজ,শকট, অট্টালিকার মানে !"

যে সমস্ত শ্রমিকরা মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে তুলেছেন, তাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে কবি সচেতন। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মূল্য পায় না। বরং সমাজপতিরা অতিরিক্ত লভ্যাংশ দিয়ে আকাশচুম্বী ইমারত গড়ে তুলেছে।

যেখানে ক্ষমতা লোভী ধনী শ্রেণীর মানুষ পাগলা কুকুরের মত মেহনতী মানুষের সুখ শান্তিকে স্বার্থের অগ্নিকুন্ডে আহুতি দিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বদ্ধ পরিকর। নজরুল বিশ্বাস করতেন সে জনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও গ্লানির বোঝা দূর করা যায়। সুতরাং মানুষকে জাগাতে হবে । তাই দুর্বল মানুষদের সাহস জুগিয়েছেন এবং ইংরেজদের আঘাত হানার প্রেরণা দিয়েছেন। সমাজ গড়ার লক্ষে নজরুল তাই চাষী ভাইদের ডাক দিলেন।

"আজ জাগ রে কৃষান, সব তো গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ওই বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয় কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল"

এতকাল জমিদার কর্তৃক প্রজা নিগৃহীত হয়ে আসছে। প্রজারা শুধু বিদেশী শাসকের দ্বারাই প্রতারিত হয়েছেন এমন নয় দেশীয় জমিদারদের দ্বারাও নানা ভাবে শোষিত। ফলে নজরুল শ্লোগান তুললেন 'লাঙ্গল যার জমি তার' । এই শ্লোগান আসলে কৃষক শ্রমিকের আবেগের

কথা। নজরুল শ্রমিকের গান কবিতায় লিখেছেন —

"যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা—উজির মারছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।
এবার জুজুর দল ওই হুজুর দলে
দলবিরে আয় মজুর দল !
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।।"

নজরুল কাব্য- কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক- শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছেন। 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধের মধ্য দিয়েও কৃষক - শ্রমিকের গান গেয়েছেন। 'শ্রমিকের গান' কবিতার মধ্য দিয়ে যে সুর বেজে উঠে 'রুদ্রমঙ্গলের' মধ্য দিয়েও প্রায় একই সুর বেজে উঠে ছে।

"জাগো জনশক্তি ! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, হে আমার মুটে- মজুর ভাইরা ! তোমার হাতের এ -লাঙ্গল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক- উলটে ফেলুক ! আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙো ওই উৎপীড়কের প্রাসাদ- ধূলায় লুটাও অর্থ -পিশাচ বল- দর্পীর শির। ছোঁড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধরো তোমার বুকের রক্ত -মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা ! যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আনো।"

আবার 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধে নজরুল ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা সম্পর্কে বলেছেন— "স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ হায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশির মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না । যাঁরা রাজা বা শাসক হয়ে এ -দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে।"

নজরুল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দিয়েই কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। কবি 'আমি' দিয়েই সমস্ত বেদনা, ক্ষোভ, জ্বালাকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। যুবসমাজের প্রাণের কথাকেই কবি 'আমি' র মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'আমি' কে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমষ্টিসত্তার একটা বিরোধ লেগে যায়। পরবর্তীকালে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় কবি বলেছেন বেদনা, ক্ষোভ ও জ্বালাকে একার দ্বারা প্রশমিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন—"রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা।" নজরুল একাই যেভাবে বিদ্রোহ

শুরু করেছিলেন, সেভাবে আর সম্ভব নয় বলেই কবি মনে করেছেন। অর্থাৎ সমষ্টিগত লড়াইয়ের প্রয়োজন।

নজরুল বাংলা কাব্যসাহিত্যে এমন সুরের সৃষ্টি করলেন যে সুর পুরাতন সাহিত্যের সংকোচন এবং সনাতনী ভাবধারার ভাঙন ধরিয়েছিল। তাঁর কাব্য সাহিত্যের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত জাতীয়তা ভাবোদ্দীপক কাব্য। দ্বিতীয় স্তরটি সাম্যবাদী ভাবধারা, আর তৃতীয় স্তরটি কবি জীবনের শেষের দিকের সঙ্গীতপ্রধান কাব্য। জাতীয় ভাবোদ্দীপক স্তরে আলোচনা পূর্বে কিছু কিছু করা হয়েছে। এবারের সাম্যবাদী এবং সঙ্গীতপ্রধান কাব্য বিষয়ে আলোচনা করা হল।

নজরুল সাম্যবাদী ভাবধারার ক্ষেত্রে সামাজিক যে সমস্ত অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সামাজিক যে সমস্ত অসাম্য বিশেষ করে জাতিগত বিভেদ, ধনী-গরীবের বিভেদ শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বিভেদ, নারী-পুরুষের বিভেদ। নজরুল ব্যক্তিগত জীবনে মুসলমান হলেও মনে ধর্মমুক্ত ছিলেন। তিনি হিন্দুও হতে চাননি, আবার মুসলমানও হতে চাননি। তিনি চেয়েছেন মানুষ হতে। মানুষ হয়ে মানুষের কাছাকাছি যেতে চেয়েছেন, তাদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছেন। তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সে কি ভয়ানক দাঙ্গা ! কবি এসব দেখে আর ঠিক থাকতে পারেননি। কবি ধর্মের এহেন বাড়াবাড়ি দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁর মতে ধর্ম আজ টিকির গিটে আর দাড়ির ঝোপে স্থান নিয়েছে। তিনি 'সাম্যবাদী' কাব্যের 'মানুষ' কবিতায় সেকথা তুলে ধরেছেন।

"তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোল্লা- পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !

কবির কাছে মনে হয়েছে মন্দির আর মসজিদই হচ্ছে শয়তানদের মন্ত্রণাগার। কারণ ধর্মের নামে শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলি নিয়ে চলছে সাম্প্রদায়িক দলাদলি। ধর্মের নামে বজ্জাতের দল মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও যেন হার মানাচ্ছে। সেই কারণে কবি বলেন –

"মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার"

'শেষ সওগাত' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়' কবিতায় ধর্মীয় গোঁড়ামীকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন।

"যাহারা গুন্ডা, ভন্ড, তারাই ধর্মে আবরণে
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগনে।
... ...

ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে করো সব শেষ।"

সমাজে নারীরা চিরকালের জন্য অবহেলিত। তারা যেন অবহেলার জন্যই জন্মেছে। অথচ সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারের অংশীদার কি নারীরা হতে পারে ? সমাজের অত্যাচারেই নারীরা পতিতায় পরিণত হয়। অথচ এই নারীকুল থেকেই জন্ম নিয়েছে দ্রোণ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মহান দেবতাগণ। সমাজে পুরুষরা দোষ করলে কোনো শাস্তি হয় না। আবার পুরুষের জন্যই যদি কোনো নারী দোষ করে তবে সে ক্ষেত্রে দোষের দায় পড়ে নারীদের উপরই। নজরুল প্রশ্ন করেন এমনটা কেন হবে ? নারীদের এই হীন অপমানের জন্য নজরুল বলেছেন —

"শোনো মানুষের বাণী,
জনমের পর মানব জাতির থাকে নাকো কোনো গ্লানি!
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।
অহল্যা যদি মুক্তি লাভে মা, মেরী হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি ?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন গোঁড়া পারে গালি ?
তাহাদের আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—
... ...
শুনো ধর্মের চাই —
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই !
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ - পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়! "

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র নজরুলই বোধ হয় খোলাখুলি ভাবে ধর্মের ভেদাভেদের কথা এত স্পষ্ট করে বললেন। আসলে নজরুল মুসলমান ধর্মে জন্ম গ্রহণের ফলে এত বেশি অবহেলার পাত্র ছিলেন যে সেই সময় আরে কেউ এতটা জাতিগত সমস্যার মধ্যে পড়েনি। পূর্বেই বলেছি নজরুল হিন্দু মানে না মুসলমান মানে না। তাই তিনি বলেছেন—

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কান্ডারী ! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা-র!"

নজরুল আবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে হিন্দু মুসলমান আসলে একই বৃন্তের দুটি কুসুম। সবাইকে জানিয়ে দিলেন —

"মোরা একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।"

এইভাবে সাম্যের গান দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কাছে সবাই মানুষ । কেউ ছোটো বা বড় নয় । সেকথাই বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—

"মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, কিছু মহীয়ান!"

এইভাবে মানব মহিমার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নজরুল তাঁর সাম্যবাদী ভাবধারাকে শুধুমাত্র কাব্যকবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েও সেই সাম্যবাদী ভাবধারাকে প্রকাশ করিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান বিভেদ নীতিকে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাম্যবাদ ছাড়া দেশের কোনো গতি নেই। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক আজহারউদ্দীন খান বলেছেন— "নজরুলের কাছেও একের অসম্মান নিখিল মানবজাতির লজ্জা- সকলের অপমান। তাই হিন্দু - মুসলমানের বিভেদনীতিকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি। কবি সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে পুরোহিতবাদ বা বাহ্যক্রিয়া- কলাপ দ্বারাই মানুষে মানুষে প্রভেদ জন্মায়।" ৪ 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'মন্দির ও মসজিদ' নিবন্ধে বলেছেন ।

"এক স্থানে দেখিলাম, ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র- অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর এক স্থানে দেখিলাম, প্রায় ওই সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত। হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ !"

দেশের যে দুরবস্থা তার প্রধানতম কারণ হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে লড়াই। কবির মতে সবাই তো মানুষ হিসেবেই জন্মগ্রহন করেছেন তবে জাতের নামে বজ্জাতি কেন ? একদিন তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে সে প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। কবিগুরু তাকে জানিয়েছিলেন জাতিগত ভেদ আসলে মানসিকতার ব্যাপার। আমাদের মনকে , চিন্তাধারাকে পাল্টাতে না পারলে এ সমস্যার সমাধান হওয়া বড় মুশকিল। 'হিন্দু-মুসলমান' নিবন্ধে কবিগুরু নজরুলকে সে কথা বুঝিয়েছিলেন।

"একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখ, যে ল্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ল্যাজকে কাটবে কে ? হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের ঐ কথাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন উদয় হয় মনে , যে, ল্যাজ গজালো কি করে ? এর আদি উদ্ভব কোথায় ... আমার মনে হয় টিকিতে আর দাড়িতে ।... অবতার পয়গম্বর কেউ বলেন নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছে , আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি।

তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি, আলোর মত সকলের জন্য।"

'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থের অনেক জায়গায় শিক্ষা সম্পর্কে কবি সোচ্চার হয়েছেন। মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাবের ফলে দেশে এত সব নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পুরাণুকরণের মাধ্যমে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বর্জন করেছে। বর্তমানের শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না, সেখানে তৈরী হয় যন্ত্র। শিক্ষাকে সবার মধ্যে প্রসারিত করতে হলে যা দরকার, সে সম্পর্কে কবি বলেছেন— "আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অণুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি, অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভাল-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায় আত্মা নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহাৎ খর্বই করা হয়। নিজের শক্তি স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝে অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। .... জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশ সেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে!"

আবার 'জাতীয় শিক্ষা' নিবন্ধেও কবি শিক্ষা সম্পর্কে একই সুরের প্রচার করেছেন— "যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ওই সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না।" 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নিবন্ধে নজরুল সেই শিক্ষার প্রচলন চেয়েছেন যে শিক্ষা মানুষের জীবন ও শক্তিকে সজাগ ও জীবন্ত করে তোলে। অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের দেহ ও মন দুইকেই পুষ্ট করতে পারে তবেই হবে আসল শিক্ষা।

নজরুল এরপর সুরের আকাশে বিচরণ শুরু করলেন। একদা কবি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক, যুদ্ধ শেষ হলে তিনি লড়াই শুরু করলেন সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, কখনো আবার ঈশ্বরকেও ছেড়ে কথা বলেননি। নজরুলের গানের বিষয়, ভাষার ছন্দ ও তালে উঠত উন্মাদনা, লড়াইয়ের কথা। দেশপ্রেম,সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানুষের নব উত্থান ছিল তার সেই সময়কার গানের কথাবস্তু। সেই পরাধীনকালের সময়ে ছাত্রদলের গান শিকলভাঙ্গার গান, শ্রমিক-কৃষক-মজুরের গান সেদিনের বাঙালীদের মাতিয়ে এবং নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর দেশপ্রেমমূলক, বীরত্বব্যঞ্জক, অসাম্প্রদায়িক গানগুলি যেন তখনকার দিনে বীজমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হত। তাঁর সেই কোরাস গানগুলি –

"কারার ওই লৌহকপাট
ভেঙ্গে ফেল করে লোপাট
রক্ত জমাট

শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদি!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি।"

আরও বিখ্যাত কোরাসগান গুলির একটি যেমন—

"চল চল চল !
উর্দ্ধে- গগণে বাজে মাদল,নিম্নে উতলা ধরনি-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল চল রে চল রে চল।
চল- চল-চল !
উষার দুয়ারে হানি আঘাত , আমরা আনিব রাঙা প্রভাত ,
আমরা টুটাব তিমির রাত,বাধার বিন্ধ্যাচল।"

এসব উদ্দীপক গানের পাশাপাশি রচনা করেছেন বহু সুন্দর সুন্দর ইসলামী গান, কৌমীগান, আর অপরদিকে সমানতালে রচনা করেছেন' শ্যামাসঙ্গীত, যেগুলিকে বলা হয় ভক্তিগীতি। এছাড়াও রচনা করেন বিখ্যাত বিখ্যাত গজল গান। এছাড়া শ্রমিক জীবনের জাগরণের জন্য রচনা করেন আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। একবার মুজফ্ফর আহমদের অনুরোধে নজরুল 'ইন্টারন্যাশনাল' সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুর সংযোজনা করেন —

" জাগো জাগো অনশন-বন্দী ,ওঠো রে যত
জাগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত !
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হাণি
হাঁকে নিপীড়িত জন-মন- মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত।।

নজরুল বার বার নারী জাগরণের কথা বলেছেন। নজরুল পূর্বেই বার বার বলেছেন নারী জাতির উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন—

"বিশ্বের যা- কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।"

শেষপর্যন্ত অসংখ্য গান রচনার মাধ্যমে নিজকে ব্যস্ত রাখতেন।শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, গজল,

এবং ইসলামী সঙ্গীত ছাড়াও গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য গান রচনা করেছিলেন। প্রায় তিন হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছিলেন নজরুল। এইভাবে নজরুল বাংলার গানের ভুবনকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় একজন বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে। এই দুজনের প্রচেষ্টায় বাংলাগান যেন জীবন্ত প্রাণ মূর্তি ধারণ করে।

ইসলামীগান এবং কৌমীগানের মাধ্যমে নজরুল মুসলিম সমাজের নবরূপায়ণ শুরু করলেন। গানের প্রচার প্রচারের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের জাগরণ ঘটাতে চান। সেই সময় বাংলাদেশের রক্ষণশীল পরিবারে গান ছিল নিষিদ্ধ। নজরুল সেই অশিক্ষিত, সংকীর্ণ মনের মুসলমানদের গানের মাধ্যমে জাগিয়ে একদিকে যেমন সামাজিক বিপ্লব ঘটান তেমনি অন্যদিকে সাংস্কৃতি বিপ্লবও ঘটান। এটা শুরু হয়েছিল ইসলামী ও কৌমীগানের মধ্যদিয়ে এবং পরিনতি ঘটেছিল বৃহত্তর সঙ্গীতের জগতে জাগরণে আবার অন্যদিকে মুসলিম সমাজেরও জাগরণ ঘটল। মুসলিম সমাজ গানের মধ্যদিয়েই নিজেদের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করল। এইভাবে সামাজিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতাও বেড়ে গেল। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নজরুল সমসলোচক ড. সুবোধ কুমার যশ বলেছিলেন – "শতবর্ষ অতিক্রান্ত কবি কাজী নজরুল ইসলাম অজস্র গান রচনা করে বাংলাদেশে তথা বাঙালীর হৃদয়ে একসময়ে জোয়ার এনেছিলেন। এইসব গানের গীতিময়তা, সুররচনার বৈচিত্র্য ও উপভোগ্যতা, ভাবের সঙ্গে সুরের মেলবন্ধন বাংলাগানের ক্ষেত্রটিকে ঋদ্ধ ও বিস্তারিত করেছে। আর এজন্যই তাঁর গান আজও বিশেষ জনপ্রিয়। বৈঠকী মেজাজের গানে, গজলগানে, প্রেমসঙ্গীতে, শ্যামাসঙ্গীতে বা ভক্তিগীতে, ইসলামীগানে বা পল্লীগীতিতে তিনি সমান প্রিয়।" ৫

সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও নজরুল কখনো ধর্মীয় ভেকধারী হয়ে পড়েননি। এই সঙ্গীত ধ্যানমগ্নতা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য, সর্বহারা, পথহারার নজরুলই বাঙালীর চিরকালের নজরুল। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে- অলঙ্কারে নজরুল প্রথম শ্রেণীর কবি স্বীকৃতি পেতে পারেন। কোনো কোনো গানে রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়লেও ভাব ও ভাবনার বিস্তারে নজরুলের নিজস্বতা আছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেই নজরুলের প্রতিবাদ আবার সেই দরিদ্র্যই নজরুলকে মহান করেছে।

নজরুল কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অনেকসময় জ্বালাময়ী, ভাবাবেগের উদ্বেলতায় ভরপুর হলেও, কাব্যপ্রাণের একাত্মতায় স্পন্দন তুলতে পারেননি। আবার সারাদেশের মানুষের যে প্রাণের উদ্দীপনাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকাশের বিকল্পও কিন্তু চোখে পড়ে না। নজরুল শোষিত শ্রেণীর মানুষের কবি, কৃষক মজুরের কবি, জাতি-ধর্মাভিমানের বিপক্ষের কবি, দুর্বলের সপক্ষে বাণী রচনা করেছেন। যার ফলে নজরুলের রচনাশৈলীতে পরিশীলিত আঙ্গিক, কিংবা নিখুঁত শব্দচয়ন প্রত্যাশিত নয়। যিনি জেহাদ ও বিক্ষোভের কবিতা রচনা করেছেন, যিনি বিদ্রোহের সুরে প্রতিবাদ করেছেন, তার রচনায় তো রুদ্রতেজের ঝলক, ক্রোধ ও বোধের স্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে তো ছড়িয়ে পড়বেই। কবি বলেছেন –

"আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্ললে
বাণ ডাকে ওই জাগল জোয়ার দুয়ার- ভাঙা কল্লোলে!"

নজরুল সাহিত্য রচনায়, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে সমস্ত কাব্য কবিতা রচনা করেছিলেন তার প্রধান হাতিয়ার 'ধূমকেতু' ও 'লাঙ্গল' পত্রিকা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'ধূমকেতু'র অবদান অনন্য সাধারণ। এই 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গান, প্রবন্ধে বাংলার তরুণদের বিশেষভাবে উদ্দীপিত করতো। ১৯২২ সালে নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেন। এই পত্রিকায় তিনি 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লিখে রাজরোষে পড়েন, বিচার করে তাকে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। এরপর নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয়। অনশনকারী নজরুলকে উদ্দেশ্য করে কবিগুরু একটি টেলিগ্রাম পাঠান। সেখানে লেখা ছিল – "Give up hunger strike, our literature claims you." এই আবেদন কবিগুরু ব্যক্তিগত নয়, তা ছিল সমগ্র বাঙালীর প্রাণের কথা।

নজরুল তাঁর গদ্যরচনার মধ্যদিয়েও তৎকালীন যুগজীবনের দাবীকে সমর্থন জানিয়েছেন। গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও নজরুল একজন স্বতন্ত্র রচনাকার । পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আদায়ে নজরুল যেভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। সেই বিদ্রোহীর ভাবনা তাঁর গদ্যের ক্ষেত্রেও পাওয়া যাবে। তিনি গদ্যরচনার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রতিবাদী স্বতন্ত্র মানুষ। গদ্যের ক্ষেত্রে কখনো সাধারণ মানুষের দাবী ফুটে উঠেছে, কখনো নারী- পুরুষের সমতা, কখনো মুসলিম জনজীবনের কথা, কখনো আবার বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদের মধ্যদিয়ে দেশপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে।

নজরুল বড্ড অভিমানী। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে অভিমানের উৎস দুই রকম ভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত তিনি একজন শিল্পী। আর শিল্পী হিসাবেই সত্যের তূর্যবাদক, ভগবানের হাতের বীণা। আবার অন্যদিকে তিনি দুঃখলাঞ্ছিত, কন্টকবিক্ষত। তাঁর দুঃখবোধ অসাধারণ রকম প্রখর। দুঃখকে তিনি জানেন, আর জানেন দুঃখকে জানাতে। অর্থাৎ একই সঙ্গে নজরুল গর্বিত ও দুঃখিত, বিত্তবান ও নির্ধন।

'ব্যথার দান' গল্পে রুশবিপ্লবের প্রভাবের কথা পূর্বে একটু আলোচনা করা হয়েছে। এই গল্পের শুরুতে দুজন মায়ের প্রসঙ্গ আছে, একজন জন্মদাতা আর অন্যদিকে মা অর্থাৎ দেশমাতৃকা। গল্পে দারা একজায়গায় বলেছেন– "দু একদিন ভাবি হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার বড়-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি।" এই গল্পে মাতৃস্নেহটা মস্ত একটা শিকল হয়েছিল, যে শিকল কেটে যাওয়ায় নায়ক এখন মহিয়সী জন্মভুমিকে চিনতে দেয়নি।" এই গল্পে মাতৃস্নেহটা মস্ত একটা শিকল হয়েছিল, যে শিকল কেটে যাওয়ায় নায়ক এখন মহিয়সী জন্মভুমিকে চিনতে পেরেছে। আবার 'রিক্তের বেদন' গল্পে দেখা যাচ্ছে বাঙালী

তরুণেরা চলছে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই যুদ্ধে যাওয়াটা অবশ্যই অর্থোপার্জন। কিন্তু গল্পের নায়ক ভাবছে অন্যকথা— "জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য সে কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একই অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা- আমার ভাইরা।" এটা যদিও আত্মপ্রবঞ্চনা, কিন্তু এটা না করে উপায় নেই; নইলে নির্মম সত্যটা অহমিকায় এসে ঘা দেয়, ইংরেজের জন্য প্রাণ ত্যাগ করছি এই জ্ঞান আত্মমর্যাদাকে বিনষ্ট করে। তাই নায়ক আদর্শকে টেনে নিয়ে আসে, যুদ্ধের সঙ্গে মাতৃভক্তি যুক্ত করে দেয়। পরে অবশ্য মাকে যুদ্ধে যাওয়ার কারণ বলেছে "আচ্ছা মা ! তুমি বি,এ পাশ করা ছেলের জননী হতে চাও, না বীর মাতা হতে চাও ? নিঝুম ঘুমের আলস্যের দেশে বীর মাতা হবার মতো সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছে মা !" যুদ্ধে নায়ককে করবে বীর আর মাকে করবে বীরমাতা। এরপর মায়ের বন্ধন ছিন্ন করার কোনো নিষ্ঠুরতা নেই, বুঝিয়ে, সুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গেছে। এই গল্পের মধ্যে দেশপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ নজরুল পরাধীনতার জ্বালাকে এভাবেই ঘোচাতে চেয়েছেন।

নজরুল একদিকে যেমন বিদ্রোহী তেমনি অন্যদিকে প্রেমিক। কবি নিজেই সেকথা বলেছেন— 'ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতে বোকা, কিন্তু তাই বলে তাকে ফেলেও দিই নি। আমি গোধূলিবেলার রাখাল ছেলের সাথে বাঁশী বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দিই। আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবারি নিয়ে রণভূমে ঝাপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশী হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙা।' 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের রবিয়ল নূরুকে যে কথাটা বলেছে তা মূলত নজরুলেরই কথা "তোর উপরটা লোহার মত হলেও ভেতরটা ফুলের চেয়েও নরম।" অন্যত্র তিনি বলেছেন— "বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর।"

"বাঁধনহারা' উপন্যাসের পটভূমিকা প্রথম মহাযুদ্ধ। 'মৃত্যুক্ষুধার' পটভূমিকা বিশের দশকের শ্রমিক জীবন ও সাম্যবাদী আন্দোলন। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের সময়ে বাংলায় তখন চলছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। ফলে যুগের প্রভাব উপন্যাসগুলিতে অবশ্যই পড়বে। নজরুলের চেতনায় সাম্যবাদ ও নারীবাদ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিভিন্ন কবিতায় যেমন 'নারী', 'বারাঙ্গনা', 'মিসেস এম রহমানা' প্রভৃতিতে নারী মুক্তির কথা আছে। নারীর উন্নতি মানেই দেশের উন্নতি একথা নজরুল খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আশাবাদী নজরুল 'নারী' কবিতায় বলেছেন।—

"সেদিন সুদূর নয়—
যে দিন ধরনি পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয় !"

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীদের জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন তুর্কি, আফগানিস্থান, মিশরের নারীরা তাদের বোরখা টেনে ফেলে নতুন মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে ককেসাসে মেয়েরা আরও বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা ভারতীয় মুসলমানদের মনেও নাড়া দিয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলামও সেই পরিবর্তনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। বারাঙ্গনাদের নজরুল খারাপ

চোখে দেখেন নি, তিনি মনে করতেন বারাঙ্গনারা আসলে সমাজের দ্বারা শিকার হয়েছেন। নজরুল একবার বারাঙ্গনাদের জননী কুমারী মেরির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যার ফলে গোঁড়া মুসলমানরা তাকে কটূক্তি করতেও ছাড়ে নি।

বারাঙ্গনাদের যন্ত্রণার কথা 'মেহের নেগার' গল্পে এবং 'কুহেলিকা' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কবির স্বপ্নের নায়িকা মেহেরনেগার বারাঙ্গনার সন্তান বলে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে বলেছিলেন –"আমাকে চেননা ? এই শহরে যে
খুরশেদ জান বাঈজীর নাম শুন, আমি তারই মেয়ে।" সে আবার বলল "রূপজীবনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য অপবিত্র ! ওগো আমার শিরায় শিরায় যে অপবিত্র , পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কেটে দেখ সে লঘু রক্তবর্ণ, বিষ জর্জরিত মুমূর্ষুর মত তা নীল সিয়াহ।"

'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর সমস্ত উপন্যাস জুরে নিজেকে জারজ সন্তান মনে করে নিজেকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। পরবর্তীকালে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছে। জননীও জন্মভূমিকে সবে মাত্র স্বর্গাদপী গরীয়সী বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শিখেছে। সেই সময় সে জানতে পারল সে জারজ সন্তান। তারপর তার জীবনের রং বদলে যায়- "সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রং বদলাইয়া গিয়াছে । তাহার জীবনের আনন্দ দীপালী কে যেন থাবা মারিয়া নিভাইয়া দিয়াছে। সে মানুষের জীবনের অর্থনূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে।" জাহাঙ্গীর কামজ সন্তান বলে যেদিন লজ্জিত ও অপমানিত হয়েছেন, সেদিন বিপ্লবী নেতা প্রমও নজরুলের মনের কথা বলে জাহাঙ্গীরকে সান্ত্বনা দিয়েছে। প্রমও জাহাঙ্গীরকে বলেছেন– "যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় ত তা করছে, করবে বা করছে তারা, যারা এর জন্য দায়ী। কোন অসহায় মানুষই ত তার জন্মের জন্য দায়ী নয়।"

গল্প উপন্যাসে নজরুল বার বার নারীদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। 'রাক্ষুসী' গল্পে বাগ্‌দী বউকে সমাজ পিচাশী, রাক্ষুসী বলে এক ঘরে করে রাখে। কারণ তিনি প্রায় পাগলিনী হয়ে স্বামীকে হত্যা করেছিল। কেন হত্যা করেছিল, কারণ তার স্বামী এক বিধবাকে 'স্যাঙা' করেছিল। সেই অপরাধের জন্য সমাজ বাগ্‌দী বউকে ক্ষমা করল না। অথচ বাগ্‌দী বউ এর প্রশ্ন- "আমি যদি ঐ রকম একটা কান্ড বাধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামী ঐ জন্য আমাকে কেটে ফেলত তাতে পুরুষেরা একটী কথাও বলত না।"

'রিক্তের বেদন' গল্পেও দেখা যায় শহিদার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে নজরুল নারীদের দুরবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

"বাঁধনহারা' উপন্যাসটি যুদ্ধভিত্তিক হলেও নারী চরিত্র গুলি বেশ অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছে। নারীরা নিজেদের দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতিকে পরস্পারের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করেছে। এই উপন্যাসের প্রধান প্রধান নারী চরিত্র হল, রাবেয়া, মাহবুবা, সাহসিকা, ও

শোফিয়া। রাবেয়া ধনী ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এক ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রী বা গভর্নেসের কাছে। সেই শিক্ষয়িত্রীর মেয়ে সাহসিকার সঙ্গে রাবেয়ার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাহসিকা প্রেমে আঘাত পেয়ে এখন চিরকুমারী। তবে সাহসিকা ভেঙ্গে পড়েন নি। পুরুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সে একজন গ্র্যাজুয়েট এবং এক স্কুলের হেডমিসট্রেস। রাবেয়া মাহবুবা ও দুরন্ত শোফিকে পড়াশুনা শিখিয়েছিল একমাত্র পড়াশুনার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা থাকায়। এই উপন্যাসের মাহবুবা নারী চরিত্রটি বেশ প্রগতিশীল। মাহবুবা মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। মামারা মাহবুবাকে স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলেছিল। মেয়েরাই আবার মেয়েদের বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। মাহবুবা যেই একটু শিক্ষিতা হতে চেয়েছেন তখনি অন্য মেয়েরা তাকে টিটকিরি দিয়ে কখনো 'সিঙ্গি চড়া ধিঙ্গি' আবার কখনো 'অজবুড়ি' বলে ব্যঙ্গ করেছে। অবশ্য মাহবুবা বুঝতে পেরেছেন যে এটাই মেয়েদের সাধারণ অবস্থা। অবশ্য মাহবুবার খুব একটা উচ্চ আশা নেই। মাহবুবা সে কথা বলেছেন—''অবশ্য, অন্যান্য দেশের মেয়ে বা মেম সাহেবদের মতো মর্দানা লেবাস পরে ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বেড়াতে চাইনে বা হাজার হাজার লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে গলাবাজি করতে রাজি নই, আমরা চাই আমাদের এই তোমাদের গড়া খাঁচার মধ্যেই এটু সোয়াস্তির সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে, যা নিতান্ত অন্যায়, যা তোমরা শুধু খামখেয়ালির বশবর্তী হয়ে করে থাক সেইগুলো থেকে রেহাই পেতে।''

এছাড়া 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নজরুল জাতিগত বৈষম্যের কথাও তুলে ধরেছেন। রাবেয়া ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে জাতপাতের শিকার হননি। কারণ ব্রাহ্মরা জাতপাত মানে না। কিন্তু হিন্দুরা জাতপাতের ব্যাপারে বড় রক্ষণশীল। রাবেয়ার সঙ্গে অনেক হিন্দু মেয়ের বন্ধুত্ব ছিল । কিন্তু ছোঁয়াছুয়ি ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বন্ধুত্বের মধ্যেও কোথায় যেন আন্তরিকতা হারিয়ে যায়।

আবার 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে দেখা যায় মুসলমান আর খ্রিষ্টান জাতি পাশাপাশি অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সবই আছে। আবার মুসলমানরা অনেকে খ্রিষ্টান ধর্মে নাম লিখিয়েছেন। যেমন মেজবৌ, প্যাঁকালে একসময় খ্রিষ্টান হয়েছিলেন। অর্থাৎ একজন বিধর্মী মানুষের অতি সহজেই খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহন করা সম্ভব।

এই মূল বক্তব্যটাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ জাতিগত বৈষম্যের কথাই নজরুল তুলে ধরেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গোরাও বুঝেছিল হাজার ইচ্ছা থাকলেও একজন বাইরের লোকের পক্ষে হিন্দু হওয়া অসম্ভব।

'কুহেলিকা' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেই জাতপাতের বৈষম্য প্রধান হয়ে ওঠে। নায়ক জাহাঙ্গীর জাতিতে মুসলমান ফলে তাকে বিপ্লবী দলে যোগদান করানো যাবে না। একদল প্রতিপক্ষ জাহাঙ্গীরের জাতি নিয়ে প্রশ্নও তোলেন। এ ব্যাপারে একজন বিপ্লবী সমরেশ প্রমত্তর কাছে অনেক যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল যদিও প্রমত্ত এসব ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। প্রমত্ত অনেকটাই উদার প্রকৃতির লোক। সমরেশ বলেছিল মুসলমানদের মধ্যে আপেক্ষিক শিক্ষার অভাব, মোল্লা মৌলবীদের প্রভাব, বিদেশী মুসলমানদের বেশি আপন করা ইত্যাদি। প্রমত্ত যুক্তি দিয়েছিল- ''জানি মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে

মোল্লা মৌলবীর। তাদের রুটি রোজগার মারা যাবে যাতে করে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে, - সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্র সমাজ। ... এজন্যই আমি বেছে বেছে মুসলমান ছাত্র নিতে চাই আমাদের দলে এবং এইখানেই আমার সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবী নেতার বাধে খিটিমিটি।" তবে শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরকে বিপ্লবী দলে নিয়োগ করলেও একটা কিন্তু জাতিগত বৈষম্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র :

১। গুপ্ত, ড. সুশীল কুমার : নজরুল চারিত-মানস, দেজ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১২, পৃ: ২৫।

২। আহ্মেদ, মুজফ্ফর : কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১২, পৃ: ৬২।

৩।যশ, ড. সুবোধ কুমার : নজরুল : অনুভবে অন্বেষণে, গ্রন্থবিকাশ, প্রথম সংস্করণ, ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ: ৩।

৪। খান, আজহারউদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স, পৃ: ৩৮৩।

৫। যশ, ড্র সুবোধ কুমার : তদেব, পৃ: ৮।

৬। এই অধ্যায়ে পদ,বাক্য গৃহিত হয়েছে যে গ্রন্থ গুলি থেকে, উক্ত গ্রন্থগুলি হল – কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র(১ম,২য়,৫ম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৫।

এবং

সিংহ রায়, জীবেন্দ্র : কল্লোলেরকাল, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩।